বিজ্ঞান অন্বেষক

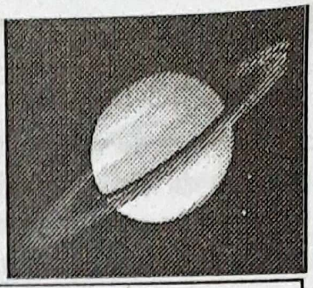

বর্ষ-১৩ সংখ্যা - ৩ মে - জুন ২০১৬ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

চিন্তামনিকর

পাখিরালয়

'ঘরের কাছে আরশিনগর/ সেথায় পক্ষী বসত করে' আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গে পাখিরালয় বা পক্ষী নিবাসের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। তার মধ্যে একটি সে প্রায় কলকাতার বুকের ওপর অবস্থান করছে তা কিন্তু খুব বেশি মানুষের জানা নেই। কিঞ্চিৎ অসচেতনতা ও অবহেলার আড়ালে রয়ে যায় 'চিন্তামনি কর পাখিরালয়'।

চিত্র ঃ কাজল গাঙ্গুলী

কবি নজরুল মেট্রো ষ্টেশনে নেমে রাজপুর গামী অটো বা বাসে চেপে মাত্র কিমি চারেক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন অতিক্রম করে নামতে হবে রথতলা স্টপেজ। সেখান থেকে হেঁটে ৪-৫ মিনিট দূরত্বে প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামনি কর এর নামাঙ্কিত এই পক্ষী নিবাসের প্রবেশদ্বার। প্রায় চুয়ান্ন বিঘা এলাকা নিয়ে গঠিত এই প্রাচীন আম বাগানটি অতীতে ব্যক্তিগত মালিকানায় 'কয়ালের বাগান' নামে পরিচিত ছিল। ১৯৮২ সালে একে অভয়ারন্য রূপে ঘোষণা

এরপর 4 পাতায়

পরিবেশ : অর্থনীতি

জীবপ্রজাতি : বিপন্নতা ও বিনাশ

সৃষ্টির শুরু থেকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অগুনতি প্রজাতির বিনাশ ঘটেছে বা পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে। যে কোন প্রজাতির যখন চিরতরে হারিয়ে যাবার ভয় থাকে তখন তাকে বিপন্ন বলা হয়। প্রজাতির বিনাশ যদি প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক নিয়ম হয় তাহলে তাকে নিয়ে কি মাথা ব্যথার কোন কারণ থাকে? এদের কি কোন মূল্য আছে? বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ থেকে দেখা গেছে যে বর্তমানে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের বাসভূমি ধ্বংস হবার কারণে। অতীতে প্রজাতিগুলি এই হারে বিলুপ্ত হয়নি। পৃথিবীতে প্রতি ২০ মিনিটে বর্তমানে একটি করে প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রজাতিগুলির বাসভূমি ধ্বংস হবার কারণগুলিও আমাদের জানা -'উন্নয়নের নামে মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধ নানান হঠকারী কাজ, দূষণ, বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রয়োজনের বেশি প্রজাতিগুলির ব্যবহার এমনকি সরাসরি বিষ দিয়ে এদের মারা, মানুষের নিজের ইচ্ছামতো বিদেশি প্রজাতির ব্যবহার, নানান রোগবালাই ইত্যাদি।

জীববিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে আমেরিকার মতো ধনী ও উন্নত দেশে ১৬২০ সালে প্লাইমাউথ রক- এ পিলগ্রিমরা আসার পর থেকে আজ অব্দি প্রায় ৫০০টিরও বেশি প্রজাতি, উপ-প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে গেছে। পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের ৩১ শতাংশ জুড়ে রয়েছে বনভূমি। এসব বনভূমিতে রয়েছে এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতি। পৃথিবীর প্রায় ১৬০ কোটি মানুষের জীবন এই বনভূমির ওপরে নির্ভরশীল। পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৩০ কোটি মানুষ থাকে এই বনভূমিতে। পৃথিবীতে মোট যত স্থলজ জীববৈচিত্র্য দেখা যায় তার ৮০ শতাংশ দেখা মেলে এই বনভূমিতে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে রয়েছে

এরপর 2 পাতায়

মঙ্গলগ্রহেও শনির বলয়

আমরা জানি শনিগ্রহের চারদিকে একটি বলয় বা রিং আছে, বিভিন্ন গ্রহানুর টুকরো দিয়ে তৈরি সেগুলো। তবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্‌বানী করে বলেছেন সুদূর ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহের একটি উপগ্রহ ফোবোস টুকরো টুকরো হয়ে মঙ্গল গ্রহের চারদিকে একটি বলয়ে পরিণত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানী বেওদামিন ব্ল্যাক কে এই গবেষণাতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক বিজ্ঞানী তুষার মিত্তল। আসলে মঙ্গল গ্রহের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বল সহ্য করার কোনও ক্ষমতা নেই ফোবোস এর ভঙ্গুর পৃষ্ঠতলের। একই ভাবে নাকি পৃথিবীরও আরেকটি উপগ্রহ, দূর্বল ভূপ্রকৃতির জন্য গুঁড়ো হয়ে গেছে। সেই উপগ্রহটির কিছুটা অংশ চাঁদের সাথে একত্রিত হয়ে গেছে। সেজন্যই চাঁদের মহাজাগতিক ভারসাম্য, কিছুটা নষ্ট হয়েছে বলে মনে করে সান্তা ক্রুজ এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিক অ্যাসফাউগ। পৃথিবীর ওই উপগ্রহটি টিঁকে ছিলো প্রায় ১০ মিলিয়ান বছর ধরে। বেঞ্জাসিন ব্ল্যাক এর মতে ফোবোস মঙ্গলের বলয়ে পরিণত হবে আগামী ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ান বছর পরে।

লেখক ঃ কৌশিক রায়,
মোঃ- ৯৫৪৭৬৫৯৬৭৯

জীবপ্রজাতি : বিপন্নতা ও বিনাশ

1 পাতার পর

পৃথিবীর প্রায় ৬০ শতাংশ বনভূমি। বনবিজ্ঞানীরা বলেন এই ক্রান্তীয় বনাঞ্চলেই দেখা যায় পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির ৮০ শতাংশ। এখানেই প্রায় ১৪০০ প্রজাতির এমন গাছ রয়েছে যাদের ক্যান্সার রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে। নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্যও জীববৈচিত্র্যের এক বিপুল ভান্ডার। আয়তনে এটি পৃথিবীর মাত্র ৬ শতাংশ হলেও মোট জীববৈচিত্র্যের প্রায় ৫০ শতাংশ এখানে দেখা যায়। পৃথিবীতে গড়ে বর্তমানে বছরে ৩ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টর এই বৃষ্টি অরণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এই আয়তনটি পোল্যান্ড দেশের থেকে বেশি। ফলে অগুনতি প্রজাতি তাদের বাসভূমি হারিয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে।

টাকার অঙ্কে বনভূমির কি কোন দাম হয়? বা কীভাবেই বা এর দাম ঠিক করা হয়? বনভূমির গাছগুলিকে প্রধানত কাঠ তৈরির কারখানা হিসেবে দেখা হয়। বনভূমির প্রধান বনজ সম্পদ নানা ধরণের কাঠের বাজার দর হিসেবে এদের দাম ঠিক করা হয়। এরপর সেই বনভূমি থেকে পাওয়া অন্যান্য অ-প্রধান বনজ সম্পদের বাজার দর অনুযায়ী কোন বনাঞ্চলের টাকার অঙ্কে দাম ঠিক করা হয়। এই বাজারি মাপকাঠিতে সারা পৃথিবীতে ২০০৫ সালে বনজ সম্পদের ব্যবসার পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৭৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (রাষ্ট্রসংঘ, ২০১১)। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নানান ধরণের বনভূমির হেক্টর প্রতি বেঁধে দেওয়া দাম অনুযায়ী আমাদের দেশে বনভূমির মোট বাজারি দাম ৫৯,২০,১৯০.২ কোটি টাকা (ডাউন টু আর্থ, ৩১ জুলাই, ২০০৫)। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই দামের মধ্যে বনভূমি তার প্রধান-অপ্রধান বনজ সম্পদ ছাড়াও আর যে সব জীবনদায়ী পরিষেবা দেয়, যেমন - বিপুল পরিমাণ জীববৈচিত্র্যের বাসভূমি রূপে, ঝড় ও বন্যা প্রতিরোধকারী রূপে, মাটির ক্ষয় আটকে, বায়ুশোধক রূপে, জলবিভাজিকা রূপে। অথচ এসেবর দাম কখনও ধরা হয় না। প্রকৃতিতে গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি পরিণত গাছ বছরে প্রকৃতি থেকে প্রায় ১২ কিলোগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড নিজের দেহে টেনে নেয়। পরিবর্তে চারজনের এক পরিবারের সারা বছরের নিঃশ্বাস নেবার অক্সিজেন জোগায়। তাই বনভূমিকে বলা 'পৃথিবীর ফুসফুস'। বনভূমি মাটিতে ঝরে পড়া পাতা থেকে জীবভর তৈরি করে মাটিকে সমৃদ্ধ ও উর্বর রাখে। বনাঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হয়। বনভূমি মিঠা জলের সবচেয়ে বড় জোগানদার। দেখা গেছে যে পৃথিবীর প্রাপ্ত মোট মিঠাজলের প্রায় ৭৫ শতাংশ আসে বনভূমি ঘেরা অঞ্চল থেকে। এমনকী মিঠাজলের গুণগত মানও বনভূমির ওপর নির্ভর করে। উদ্ভিদবিদরা বেশ কিছুদিন আগে এক হিসেব করে দেখেছিলেন যে প্রতিটি গাছের এসব কাজের অর্থমূল্য বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকারও বেশি।

বিপন্ন প্রজাতিদের বাসভূমি রক্ষা কীভাবে করা যায় বা এদের বাসভূমি কীভাবে গড়ে তোলা যায় তার আর্থিক সুবিধাগুলি বর্তমান বাজারি অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোনরকম বাণিজ্যিক উন্নয়নের আর্থিক সুফল খালি চোখেই দেখা যায়। যদিও এই সুফলটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে গুটিকয় মানুষের মধ্যে। কিন্তু বিপন্ন প্রজাতিদের রক্ষা করতে পারলে তার সুফল ছড়িয়ে পড়ে সকলের মধ্যে। এখানে একটি কথা আছে। বিপন্ন প্রজাতিদের রক্ষা করার কী সুফল রয়েছে আর কেনই বা তা করা হবে, আর্থিক ভাবে এই হিসেবটি স্পষ্ট না করলে একথা মনে হওয়া এতটুকুও আশ্চর্যের নয় যে এই প্রজাতিগুলির বাসভূমি রক্ষায় খরচ করার থেকে নানান বাণিজ্যিক উন্নয়নে টাকা ঢালাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর এখানেই 'অর্থনীতি' ও 'পরিবেশ' এর মধ্যে টানাপোড়েন কাজ করে।

টানাপোড়েন এর এই বিষয়টি একটু খুলেই বলা যাক। একজন পরিবেশবিদ সবসময় উন্নয়ন, উৎপাদন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বাজারি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির 'সীমা'র ব্যাপারে অর্থাৎ পরিবেশের ওপরে খবরদারি করতে গিয়ে বর্তমানে মানুষ কোথায় গিয়ে থামবে তা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। অন্যদিকে একজন অর্থনীতিবিদ এরকম কোন বিশেষ সীমাকে চিহ্নিত করতে খুব একটা রাজি নন। পরিবেশবিদ প্রকৃতি থেকেই নানান তথ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্রের যথাযথ কার্যকারিতার কথা ভাবেন। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ বিশ্ব অর্থনীতির অভূতপূর্ব বিকাশ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, লগ্নি ও ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়ে ভাবতে বেশি আগ্রহী। এতেই তিনি আগামী দিনের মানুষের সুখসমৃদ্ধি দেখতে পান। পরিবেশবিদও এই একই বিকাশ দেখেন, আর ভাবেন যে এই বিকাশ এসেছে দীর্ঘকাল ধরে প্রচুর জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে, যার কুপ্রভাবে আজ এই পৃথিবীর উষ্ণতা গেছে বেড়ে। জলবায়ু গেছে বদলে। জৈববৈচিত্র্য যাচ্ছে হারিয়ে। অর্থনীতিবিদ যখন অর্থনৈতিক বিকাশের সুউচ্চ সূচকগুলিকে দেখে বেশ খুশি হন তখন পরিবেশবিদ ওই একই অর্থনৈতিক কাঠামোয় জলবায়ু বদলে যাওয়ার কারণগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করেন। এর সম্ভাব্য কুপ্রভাবের কথা ভাবেন যা নিয়ে অন্য কেউ সেভাবে মাথা ঘামান না। এটি সত্যি যে বাজারি অর্থনীতি সবসময় প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে যথাযথ ছবিটা আমাদের সামনে তুলে ধরে না। যাক, এসব তর্ক সরিয়ে রেখে একথা আজ সহজেই বলা যায় যে পৃথিবী জুড়ে নানা প্রজাতির বিপন্নতা ক্রমশই বাড়ছে বই কমছে না। প্রজাতিগুলিকে রক্ষা করতে পারলে তাদের থেকে কী সুফল আমরা পাব এই হিসেবটি প্রথমেই করে নেওয়া অতি জরুরি।

ঃ জীবপ্রজাতি ও উন্নয়ন অর্থনীতি ঃ

বর্তমানে সকল দেশ বা রাষ্ট্রই উন্নয়নের দৌড়ে মেতেছে। উন্নয়ন একটা তেপায়া-র মতো। তিনটি ধরণার ওপর ভর করে এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রথম ধারণাটি হল যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক যে কোনও সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। কিন্তু উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে বশে এনে তাকে ক্রমাগত পুঁজিতে পরিণত করার যে ঝোঁক তা উন্নয়নের চোখ এড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় ধারণাটি হল যে টাকাই হল সকল সুখের উৎস। যেহেতু টাকা দিয়ে সকল বিলাস বা ভোগ্য দ্রব্য কেনা যায়, তাই যার যত বেশি টাকা তার তত বেশি সুখ। সুখ যে মানুষের এক মনোজগতের বিষয় সেটাকেও দেখা হল আর্থিক মাপকাঠিতে। আর তৃতীয় ধারণাটি হল মানুষ তার প্রতিটি কাজই করে লাভের জন্য। কারণ সবসময়েই সে লাভ লোকসানের হিসেব কষছে। সবচেয়ে বেশি লাভের তাগিদ মানুষের জন্মগত এক সত্তা। অর্থনীতিবিদদের মতে এটি নাকি স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের মধ্যে এই তাগিদ না থাকলে অর্থনীতি এগোবে না। আর এই ধারণাগুলির ওপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক বাজারি অর্থনীতি। এই অর্থনীতি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বাজারি আওতার বাইরে সকল কিছুকে মূল্যহীন বলে তকমা সেঁটে দেয়। অর্থাৎ যার কোন বাজার দর নেই তার টিকে থাকার কোন অধিকার নেই। সে বাতিল। এই বাজারি অর্থনীতি যেমন প্রকৃতির ওপর পূর্ণ খবরদারি করতে চায়, তেমনই চায় পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষের ওপর কিছু মানুষের আধিপত্য। প্রাকৃতিক যে সব সম্পদের বাজারি বা ব্যবহারিক মূল্য আছে সেগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিংড়ে নিয়ে যত বেশি মুনাফা করা যায় বাজারি অর্থনীতির সেটিই মূল লক্ষ্য। আর যার বাজার দর নেই, অর্থাৎ আপাত মূল্যহীন, সেটি নষ্ট বা প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেলেও এই বাজারি অর্থনীতিবিদদের তা নিয়ে কোন চিন্তার কারণ থাকে না। কারণ অর্থনীতিতে তখনই এর কোন প্রভাব পড়ে না। বাজারি অর্থনীতি ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কট্টর সমর্থকরা পরিবেশ ধ্বংসের ভয়াবহতা দেখেও সকলকে প্রবোধ দেন এই বলে যে

এরপর 3 পাতায়

জীবপ্রজাতি : বিপন্নতা ও বিনাশ

2 পাতার পর

আরও উন্নয়ন হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। উন্নয়নের কোনও বিকল্প নেই। এঁদের মতে উন্নয়নের যারা শত্রু তারা মানব সভ্যতারও শত্রু। পরিবেশ রক্ষার কথা বলে এইসব মানুষেরা সভ্যতাকে পিছিয়ে দিতে চায়।

জীবপ্রজাতিগুলি থেকে আমরা যে নানান সুফল পাই তাকে ওই প্রজাতির 'পূর্ণ আর্থিক মূল্য' বলে। এই পূর্ণ আর্থিক মূল্যের মধ্যে ধরা থাকে প্রজাতিগুলির বিনোদনমূলক ব্যবহারিক মূল্য, যেমন - বন্যজন্তুদের দেখা ইকোটুরিজম, প্রকৃতি বা বন্যপ্রাণ বিষয়ক আলোকচিত্র ইত্যাদি এবং এদের অব্যবহারযোগ্য বা পরোক্ষ মূল্য যা এই পৃথিবীর বুকে রয়ে যায় আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য। এখানে উল্লেখ্য যে মজবুত উন্নয়নের পক্ষে ব্রান্টল্যান্ড কমিশন এই পরোক্ষ মূল্যটির ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। মানুষ এসব প্রজাতি ও তাদের বাসভূমি সংরক্ষণে সর্বোচ্চ কী পরিমাণ টাকা খরচ করবে তার ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদরা এই পূর্ণ আর্থিক মূল্যটি হিসেব করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ডুয়ার্সের জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে সেখানে প্রাকৃতিক বাসভূমিতে গাউর ও হাতি দেখার সুযোগের জন্য কোন পর্যটক যে পরিমাণ টাকা খরচ করতে রাজি থাকেন, টাকার অংকে সেইটিই ওই পর্যটকের কাছে প্রজাতিটির মূল্য বলে বিবেচিত হয়। প্রজাতিদের পরোক্ষ মূল্য বা পৃথিবীতে টিকে থাকার মূল্যের ক্ষেত্রেও এই একই উদাহরণের কথা বলা যায়। কোনও পর্যটক তখনই ডুয়ার্সে গিয়ে গাউর বা হাতিদের দেখতে খরচ করেন যখন তিনি ভাল করেই জানেন যে এদের জঙ্গলের স্বাভাবিক পরিবেশেই দেখতে পাবেন, চিড়িয়াখানায় নয়। আর এই খরচের টাকায় প্রজাতিগুলির প্রাকৃতিক বাসভূমি বর্তমানে রক্ষা পাওয়ার অর্থ হল আমাদের পরের প্রজন্ম আগামী দিনে এদের দেখতে পাবে। তাই আমাদের উচিত বিপন্ন এসব প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতিগুলি যে সব বাস্তুতন্ত্রের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাদের রক্ষা করা।

বনভূমির বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসীম। সামান্য এক ছত্রাক থেকে যে জীবনদায়ী ওষুধ পেনিসিলিন এর আবিষ্কার এ কথা আজ আর কারোরই অজানা নয়। মহিলাদের ডিম্বাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসার ওষুধের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ট্যাক্সল। এটি প্রধানত পাওয়া যায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একপ্রকার গাছের ছাল থেকে। অথচ যতদিন না এটির উপকারিতা জানা গিয়েছিল ততদিন এই গাছটিকে প্রায় আগাছা হিসেবেই দেখা হত। মাদাগাস্কার দ্বীপের একপ্রকার দেশি গাছ হল 'রোজ পেরিউইংকল'। এই গাছ থেকে পাওয়া যায় এমন এক শক্তিশালী উপদান যা শিশুদের লিউকেমিয়া ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সমস্ত পৃথিবীর কৃষি ও জৈব প্রযুক্তি শিল্প এবং ওষুধ তৈরির কোম্পানিগুলি এসব উদ্ভিদ প্রজাতির জার্মপ্লাজম থেকে নানান দ্রব্য তৈরি করে বিশাল মুনাফা করে। এদের মুনাফার লোভে ক্রমশই কমে আসছে জীববৈচিত্র্য। এ ঘটনার শুরু ১৯৮০-র দশক থেকে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছে ১৯৮০-র দশকে যত জীববৈচিত্র্য কমেছে তা বিগত সাড়ে ছয় কোটি বছরের ইতিহাসে ঘটেনি। অথচ উদ্ভিদ প্রজাতিদের এই অর্থনৈতিক গুরুত্ব বনভূমির বাজারি দামের বেলায় ধরা হয় না। বনাঞ্চলের কাছে থাকা গরিব মানুষের জীবন-জীবিকা অনেকটাই বনভূমির ওপর নির্ভরশীল। বনভূমির কাঠ এদের জ্বালানির প্রধান উৎস। উন্নতিশীল দেশে নানান কলকারখানা সহ মানুষ মূলত যে জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে কাঠ বা কাঠ কয়লা হিসেবে, তার ৮০ শতাংশ আসে বনভূমি থেকে। চারণভূমি হিসেবেও বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এগুলির কোনটিকেই বনভূমির দাম ঠিক করার বেলায় বিবেচনায় আনা হয় না। আর্থিক লাভ ছাড়াও বনভূমি যে আমাদের বাস্তুতান্ত্রিক সুরক্ষা দেয়, যা এই পৃথিবীতে সকল প্রজাতির সুস্থভাবে টিকে থাকতে যে কী ভীষণ জরুরি তা কখনোই ভেবে দেখা হয় না।

নানান রোগের চিকিৎসায় প্রাণীদের দেহের ব্যবহারও কম নয়। মানুষের রক্তের ঘনত্ব কমিয়ে পাতলা রাখতে এক ধরণের প্রাণঘাতী অতি বিষধর সাপের (র‍্যাটল্ সেলক) বিষ ব্যবহার করা হয়। এশীয় পিট ভাইপার এর দেহের প্রোটিন থেকে তৈরি হয় এক ধরণের ওষুধ। এটি আমাদের দেহের মেলানোমা কোষের দ্রুত ছড়িয়ে পড়াকে বাধা দেয়। অতি বিষাক্ত মাকড়সা ট্যারানটুলা-র বিষ থেকে তৈরি হয় স্নায়ুরোগের বিশেষ করে পারকিনসন্স রোগের ওষুধ। এরকম উদাহরণ অসংখ্য রয়েছে।

চাষিরা কৃষিখেতের ক্ষতিকর রোগপোকা ঠেকাতে নানা কীটপতঙ্গ ও প্রাণীদের ব্যবহার করে যারা এসব রোগপোকাদের খায়। এছাড়াও জমিতে এমন গাছপালা লাগায় যাদের দেহের স্বাভাবিক বিষাক্ত পদার্থ রোগপোকাদের তাড়াতে পারে। এভাবে জীবপ্রজাতিদের সাহায্য নেওয়াকে বলা 'জৈব নিয়ন্ত্রণ'। এই পদ্ধতি খুবই নিরাপদ, কার্যকরী এবং রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের থেকে অনেক কম খরচের। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৮০,০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির সন্ধান মিলেছে যাদের আমরা খেতে পারি। আশ্চর্যের কথা এসব উদ্ভিদ প্রজাতির ২০ শতাংশ এর কম পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের খাবার জোগায়। এব্যবহৃত বাকি প্রজাতিগুলিকে ব্যবহার করতে পারলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মুখে খাবার তুলে দেওয়া কি খুব কঠিন হবে?

প্রকৃতিতে বেশ কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা পরিবেশের গুণমানের মাপকাঠি স্বরূপ। উদাহরণ হিসেবে গাঙচিল, টাকমাথা ঈগল পাখি ও পেরিগ্রিন বাজপাখির খুব তাড়াতাড়ি কমে আসার ঘটনাকে উল্লেখ করা যায়। এদের এভাবে কমে আসার কারণ হিসেবে বিশ শতকের মাঝামাঝি কৃষিখেতে অতি মাত্রায় ডিডিটি ব্যবহারের কুফলই যে মূলত দায়ী তা আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে জানা গেছে। ক্ষতিকর ডিডিটি-র প্রভাবে এসব পাখিদের দেহে ক্যালসিয়ম বিপাক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলে এদের পাড়া ডিমের খোলা এমন পাতলা ও ভঙ্গুর হয় যে মা-পাখির সেই ডিমের ওপর বসে তা দিতেও পারে না। ফলে ডিম ফুটে বাচ্চা না বেরোতে পারায় ক্রমশ গোটা প্রজাতিটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই একই কথা বলা যায় আমাদের দেশের শকুন সম্বন্ধে। শকুন মরা-পচা জীবজন্তু খায়। গবাদি পশুর চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ডিকোফেনাকে সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়। গরু-মোষের দুধের পরিমাণ বাড়াতে একপ্রকার হরমোন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এসব পশুরা মারা গেলে এদের খেলে শকুনের দেহে ক্ষতিকর এই উপাদানগুলি যায়। উপকারী এই পাখিগুলি ক্রমশ চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে মারা যায়। এভাবে শকুনের প্রজাতিটাই সকলের চোখের সামনে প্রায় হারিয়ে গেল। কিছু প্রজাতির সাদা পাইন গাছ ও লিচেন আছে যারা বাতাসে অতিরিক্ত ওজোন গ্যাস, সালফার ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দূষক বাড়লে ক্রমশ মরে যায়। আসলে এরা সকলেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ও পরিবেশের ভয়াবহ কোন অবনমনের আগে এভাবে আমাদের বিপদ সংকেত দেয়।

পথটি চেনা জরুরি ঃ- পরিবেশের প্রধান অবদান তার বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা যা পৃথিবীর সকল প্রাণীর বাঁচার জন্য অপরিহার্য। এসব পরিষেবার মধ্যে পড়ে প্রাকৃতিক উপায়ে জল ও বাতাস শোধন, মাটির ক্ষয় রোধ, নির্বিষকরণ, জৈববৈচিত্র্যের সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করা ইত্যাদি। মানুষের কৃষিকাজ, শিল্প এমনকী চিকিৎসা ব্যবস্থারও এগুলি অন্যতম উপাদান। বছরে টাকার অংকে এই সব পরিষেবার মূল্য হিসেব করা সত্যিই কঠিন। কারণ এদের গায়ে দাম লেখা কোন কাগজ সাঁটা থাকে না। তাই বাজারি অর্থনীতিতে এসব পরিষেবার বিক্রি মূল্য থাকে না।

লেখক ঃ রাহুল রায়, মোঃ- ৯৪৩৩৫৭৫৩৬৪

পাখিরালয়

1 পাতার পর

করা হয়। ২০০৪ সাল নাগাদ তৎকালীন রাজ্য সরকার বাগানটি কিনে নিয়ে প্রথমে এর নাম দেয় 'নরেন্দ্রপুর ওয়াইল্ড লাইফ সাংচুয়ারি'। পরে সরকারি আদেশবলে এর পরিচয় হয় 'চিন্তামনি কর পাখিরালয়'।

বসন্তের এক উষ্ণ দিনে হাজির হয়েছিলাম এই বনবিতানে। কোলকাতার যানজট, যান্ত্রিক আর্তনাদ পেরিয়ে প্রবেশ করলাম পাখিরালয়ে। পাঁচ বছরের উর্দ্ধে সকলের প্রবেশ মূল্য মাথা পিছু ৫০ টাকা। ভিতরে ঢোকা মাত্র যেন চারপাশ বদলে গেল। ঘন গাছপালা, সুঁড়ি পথ, ঝোপ ঝাড়, আলো ছায়ার খেলা আর সব কিছু ছাপিয়ে পাখিদের কলকাকলি মুহূর্তে মুছিয়ে দিল পথশ্রম।

এটি প্রাচীন আমবাগান। তাই অসংখ্য পরিণত আমগাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের গায়ে হাজারো পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের আবরণ। এছাড়া অজস্র কাঁঠাল, ডুমুর, পাকুড়, নারকেল ও অন্যান্য উদ্ভিদের মেলা। অরণ্যের তলদেশ ঘন ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা। একদিকে বিস্তৃত বাঁশ ঝাড়। সামান্য একটি দুটি স্থানে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য কৃত্রিম সবুজ পলিথিন শেড্। বাগানে একটি বড় জলাশয় ও শুকনো জল যাওয়ার পথ। সমগ্র বাগানের বুক চিরে অনেক সুঁড়ি পথ এবং স্থানে স্থানে পাখিদের জলকেলি করার উদ্দেশ্যে নির্মিত ছোট ছোট সুদৃশ্য জলাধার।

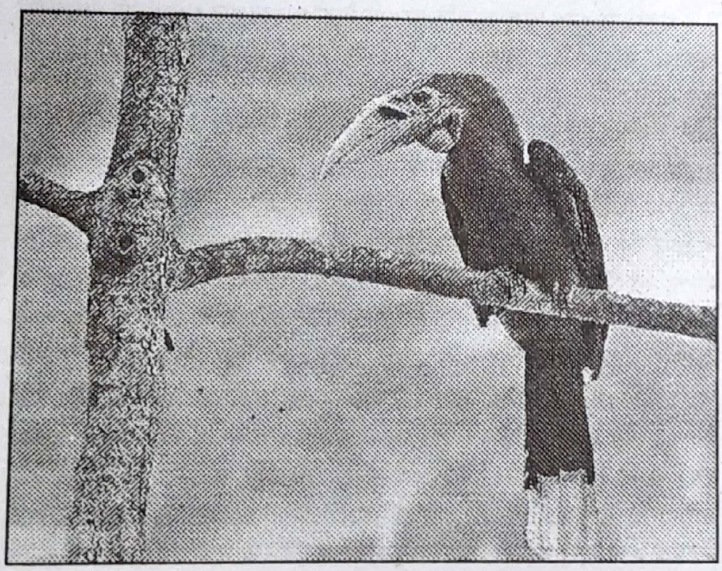

পায়ে চলা পথে খানিক এগিয়ে শুকনো নালার পাশে দাঁড়াতেই কানে এল তিন মাত্রার সরগম - 'র্সা-নি-ধা'। যেন অতি চঞ্চল ও ফাঁকিবাজ বালিকাকে অভ্যাস করতে দেওয়া হয়েছে, আর সে চমৎকার সুরেলা গলায় বারবার তিনটি পর্দা উচ্চারণ করেই আচমকা থেমে যাচ্ছে। নালা পথে ঝোপের নিচে দিয়ে ডালপালা এড়িয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম এক জোড়া চাক্ দোয়েল বা নাচন দোয়েল। গায়ের রঙ কালো, লেজ কালো-সাদা। ভ্রু ও গলায় সাদা দাগ। তারা বাহারি লেজ বারবার জাপানি হাতপাখার মত খুলছে আর বন্ধ করছে। তাইতো ইংরেজীতে এদের নাম 'Fan tail fly catcher'। ক্যামেরায় ধরার চেষ্টা করলাম তাদের। কিন্তু ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে অসম্ভব ক্ষিপ্র ও চঞ্চল এই পাখিদের ক্যামেরা বন্দি করা যে কত দুঃসাধ্য কাজ তা মালুম হল। আর একটু এগোতেই আমাকে ভয় দেখানোর জন্য মুখের সামনে দিয়ে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে উড়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, বুঝলাম বাসার খুব কাছে চলে এসেছি। ওদের নিরুপদ্রবে থাকতে দিয়ে ভিন্ন পথ ধরলাম।

উঁচু পাকুড় গাছের ডগায় বসে ডেকে চলেছে বড় বসন্ত বৌরী (Brown-headed Bar bet) - কোর-র-র-কুট্রু-কুট্রু। মোটা আম ডালে বসে ডাকছে বেনে-বৌ (Black-naped Oriole)। অশ্বত্থ গাছের পত্রহীন ডালের উঁচু ডগায় বসে টিঁয়া (Roseringed Parakeet)। তীব্র স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে এসে বসল সোনালি পিঠ কাঠঠোকরা (Lesser-Golden-Backed Woodpecker)। এছাড়াও চোখে পড়ল ছোট বসন্তবৌরী। হরবোলা, গো-শালিক, ফিঙে, কোকিল, টুনটুনি, ছিটঘুঘু, বুলবুলি, সাহেব বুলবুল, ছাতার, কুবো, সাদাবুক মাছরাঙা, বাতাসি, হাড়িচাচা, কোঁচবক, জলমুরগী, গোবক, মৌটুসি প্রভৃতি পাখি। এছাড়াও বেশ কিছু পাখি এই পাখিরালয়ে আছে। যারা আমার চোখে সেদিন ধরা দেয়নি। যেমন মুনিয়া, ধূসর রঙা ফিঙে, দুধরাজ, এমারেল্ড ঘুঘু, মোহনচূড়া বা হুপো, রাতচরা বা নাইটজার, পেঁচা, শিকরাবাজ, নীলকণ্ঠ, দামা বা অরেঞ্জ-হেডেড থ্রাস, খঞ্জন, ফটিক জল, বাঁশপাতি, হরিয়াল প্রভৃতি। শুধুমাত্র পাখি নয়, এই শান্ত একটুকরো বনভূমি কোলকাতা শহরের বুকে অসংখ্য পোকামাকড় ও ছোট প্রাণীর আবাসস্থল। বিভিন্ন প্রকারের প্রজাপতি ও মাকড়সা এখানে দেখা যায়। সব মিলিয়ে এই শুষ্ক নিরস মহানগরীর মাঝে প্রকৃতি প্রেমী মানুষের কাছে এ যেন এক স্বর্গ।

তবে কয়েকটি বিষয় একটু চোখে লাগল আমার। যেমন পাখিরালয়ের একদিকে কিছু গাছপালা কেটে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে উঠেছে। সেখানে উপযুক্ত উঁচু পাঁচিল এখানো নির্মিত হয়নি। ফলে স্থানীয় মানুষ তাদের জানা ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে জঙ্গলে। বিভিন্ন স্থানে মানুষের ভোগে ব্যবহৃত ডাব ও নারকেলের অবশেষ এই অবাঞ্ছিত প্রবেশকেই প্রমাণ করে। এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ বিশেষ আবশ্যক। সাথে সাথে আগামী দিনে মানুষের সঙ্গে এই পাখিরালয়কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে হবে।

সাধারণ মানুষ আরো বেশি করে আসুক এই পাখিরালয়ে। মুক্ত অবারিত প্রকৃতির সবুজ কোরোফিল মুছে দিক নাগরিক কান্তি। নতুন প্রজন্ম পরিচিত হোক বাংলার চিরায়ত গাছপালা, পাখি আর কীট পতঙ্গের সাথে। তবে কয়েকটা বিষয় খেয়াল রেখেই আসতে হবে এই পক্ষা নিবাসে।

এ কোন চিড়িয়াখানা নয় যে পাখিরা নির্দিষ্ট খাঁচায় দর্শণের অপেক্ষায় থাকবে, বরং মুক্ত প্রকৃতির আনাচে কানাচে ছোট্ট পাখিকে খুঁজে নিতে হবে অনেক কষ্ট স্বীকার করে। তাছাড়া এই এলাকা 'No Plastic Zone', তাই ঐ সকল বিজাতীয় দ্রব্য বা খাবার দাবারের অবশিষ্টাংশ যেখানে সেখানে ফেলে আসা যাবে না।

সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিশেষত শীত ও বসন্তে এই পাখিরালয় বিশেষ উপভোগ্য। চরম গ্রীষ্মেও দগ্ধ মহানগরীর তুলনায় এই ছায়া ঘেরা অরণ্য আরামদায়ক। এ সময়ে বাঁধানো জলাধারগুলির নিকটে বিনা আয়াসে পাখিদের দেখা যায়। তাই প্রকৃতি প্রেমী মানুষের আগমনে মুখরিত হোক 'চিন্তামনি কর পাখিরালয়'। জীবন যাপনের টানাপোড়েন, প্রতিযোগিতা ও ব্যস্ততায় ভরা এই মিছিল নগরীর বুকে একটুকরো স্বপ্ন। সবুজ ফুসফুস হয়ে বেঁচে থাক এই রূপকথার দেশ।

লেখক ঃ রাজদীপ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক, কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপ্যাল পলিটেকনিক হাইস্কুল (উঃ মাঃ), মোঃ-৯৮৩৬৫৬৯৮৫০

বাঙালীর চির পরিচিত কই মাছ

পুকুরে কই মাছ প্রতিপালন পদ্ধতি

পুকুরে কই মাছের প্রতিপালন পদ্ধতি ঃ— ছোট অগভীর পুকুর, যেখানে সারা বছর জল থাকে না, সেখানে কই মাছ চাষ করা যেতে পারে। বর্ষব্যাপী মাঝারী ও বড় পুকুরেও এই মাছ প্রতিপালন করা যেতে পারে কিন্তু জলস্তরের উচ্চতা ১০-১২ মিটারের বেশী না হওয়াই ভাল। রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের সঙ্গেও কই মাছ চাষ করা যাবে, সেক্ষেত্রে ৪ ইঞ্চির চাইতে বড় রুই কাতলা মাছের চারাপোনাদশা পুকুরে মজুত রাখতে হবে। ১০-১২ গ্রাম বা একটুকম ওজনের ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের কই মাছের ফিনগারলিং দশা পুকুরে মজুত রাখা হয়। মাগুর, শিঙ্গি এবং কইমাছ একত্র চাষের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ৩টি মাছ যদি ২:২:১ অনুপাতে হেক্টরপ্রতি জলে মোট ৪০০০০-৭০০০০ সংখ্যায়

মজুত রাখা হয় (সবই প্রায় ১০-১২ গ্রাম ওজনের অপরিণত দশা), তাহলে পরবর্তী ৯-১০ মাস চাষপর্বের শেষে কইমাছ এককভাবে ৭৫-১০০গ্রাম দৈহিক ওজন অর্জন করবে। সাধারণতঃ ৯-১০ মাস কইমাছ পালনপুকুর থেকে ধরার উপযুক্ত হয়। উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটীতে প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রপুর-বটতলা মৎস্যবীজ বাজার থেকে প্রাপ্ত ২২-২৪ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্রাইদশা অনেকে পালনপুকুরে বর্গমিটারপ্রতি ৮টি ঘনত্বে (হেক্টরপ্রতি ৮০০০০ সংখ্যায়) মজুত রেখেছিলেন, সাড়ে চার-পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে এককভাবে সেইগুলি ৫০-৬০ গ্রাম ওজন অর্জন করেছিল। বাড়ন্ত অপরিণতদশাগুলিকে প্রতিদিন ভিজানো চিঁড়ে অথবা চলের কুঁড়ো (তুঁষবাদে), সরষের খোল এবং রেশমগুটি পোকার গুড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। এছাড়াও শুঁটকী মাছের গুড়ো এবং চালের গুড়ো ২:১ অনুপাতে একত্রে মিশিয়ে পুকুরে মজুত রাখা মাছের মোট শারীরিক ওজনের ১০-১২ শতাংশ হারে প্রথম ২ মাস এবং পরে ৩-৫ শতাংশে হারে প্রতিদিন পরিপূরক খাবার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। এই মাছ চাষে পুকুরে কোন অজৈব সার প্রয়োগ করবার দরকার হয় না, মাসে একবার করে কলিচুন হেক্টরপ্রতি ৪০ কেজি হারে প্রয়োগ করে পুকুর জীবাণুমুক্ত রাখা দরকার। প্রথমেই অবশ্য পুকুরে জাল টেনে মৎস্যভুক রাক্ষসে মাছ সরিয়ে ফেলা দরকার। তারপর কইমাছের চারা মজুতিকরণ। পুকুরে বাঁশ বা খুঁটি পুঁতে উপরে বালব ঝুলিয়ে রাখলে আলোতে আকৃষ্ট হয়ে পোকা-মাকড় জলে পড়বে যেগুলি কইমাছের খাদ্য হিসেবে কাজে লাগবে। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত ছোট জলাশয় কইমাছ চাষের মাধ্যমে সংস্কার করা যেতে পারে চাষের জন্য কমবেশী ১ বিঘা আয়তনের পুকুর নির্বাচন করাই ভালো।

কই মাছ প্রতিপালন প্রসঙ্গে ঃ— আঁতুড় পুকুরে ৬০-৭২ ঘন্টার কইয়ের লার্ভাদশা যদি হেক্টরপ্রতি জলাশয়ে ১০ লক্ষ সংখ্যায় মজুত রাখা হয় তাহলে ৮ সপ্তাহ প্রতিপালনপর্বের শেষে সেইগুলি এককভাবে প্রায় ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য অর্জন করে ফিনগারলিং দশায় উন্নত হয়। এমন অবস্থায় পালনপুকুরে মজুত রাখলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। হ্যাচারিতে হরমোনজাত ঔষধ ওভাপ্রিম প্রজননক্ষম পুরুষ এবং স্ত্রী কই মাছকে প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ১.৫ মিলিলিটার মাত্রায় ব্যবহার করে ডিম পাড়ানো এবং বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। লার্ভাদশাগুলিকে আয়তক্ষেত্রাকার সিমেন্টের আধারে অথবা আঁতুড় পুকুরে সিদ্ধ করে নেওয়া ডিমের কুসুম, ক্ষুদ্র আর্টেমিয়া চিংড়ির লার্ভাদশা এবং শুকনো করে নেওয়া অণুপ্রাণী খাদ্যকণা ড্যাফনিয়ার গুড়ো একত্রে মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয় এবং ২১-২৪ দিনের মধ্যে সেইগুলিকে ফ্রাই দশায় উন্নত করানো হয় (দৈর্ঘ্য ২৪ মিলিমিটার)। কই মাছের পালনপুকুরে ব্যবহারযোগ্য পেলেট (দানা) পরিপূরক খাবার তৈরী করা হয়েছে, যা খুবই বাড়বৃদ্ধিসহায়ক। এর মধ্য রয়েছে শুকনো সামুদ্রিক মাছের গুঁড়ো, মুরগীর পরিপূরক খাবার, সোয়াবীন গুঁড়ো, বাদামের খোল, চালের কুঁড়ো এবং ফ্যাট-বর্জিত রেশম গুটি পোকার গুঁড়ো। তবে বাণিজ্যিক কারণে প্রস্তুত দামী ও প্রসিদ্ধ সিপি ব্র্যান্ডের পরিপূরক দানা খাবার নিয়মিতভাবে খাওয়ালে ৫০০ মিলিগ্রাম ওজনের ফ্রাই দশাগুলি সার চাষ - পাঁচ মাসের মধ্য প্রায় ৬০ গ্রাম ওজন অর্জন করবে।

যে পুকুরে ৬ মাস জল থাকে, সেখানে ফিনগারলিং দশা মজুত রাখলে ও ঘরোয়া খাবার খাওয়ালে ছয় মাসের শেষে কই মাছ ৬০-৭৫ গ্রাম পর্যন্ত দৈহিক ওজন অর্জন করবে। শুধুমাত্র কই মাছ (শিঙ্গি, মাগুর বাদ দিয়ে) চাষে যদি হেক্টর প্রতি ৪০০০০ ফিনগারলিং, তাহলে উৎপাদন পরিমান দাঁড়াবে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৭০০ কেজি। কই মাছের পৃষ্ঠপাখনায় ১৭-১৮টি এবং পায়ুগত পাখনায় ৯-১০টি তীক্ষ্ম শক্ত কাঁটা থাকে, আঁশগুলির মুক্তপ্রান্ত ধারালো ও খরখরে এবং ফুলকা আবৃত দুইপাশের কানকো দুইটিও কাঁটাধারণকারী, তাই পরিণত কই মাছ খালি হাতে ধরবার সময়ে খুব সতর্ক থাকতে হয়। বর্ষার সময়ে প্রায় দুই ফুট উচ্চতায় জলমগ্নধানজমিতে বেড়ে ওঠা ধানগাছ থেকে ধানের ফুল খাওয়ার জন্য পরিণত কই মাছকে অনেক সময়ে লাফিয়ে উঠতে দেখা যায়। জমির জলে ধানের ফুল খসে পড়লেও কই মাছ সেইগুলি খেয়ে ফেলে এবং প্রায় ১০০ গ্রাম ওজন অর্জন করে। কই মাছের ব্যাতিক্রমী ধারালো শরীরের জন্য জলচর মাছরাঙা পাখিও এই মাছ শিকার করে মুখে ধরতে সাহস পায় না। পূর্ব ভারতে কই মাছের চাষ ধীরে ধীরে

জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে পেশাদারী মৎস্যচাষীরা ৭-৮ গ্রাম ওজনের

এরপর ৬ পাতায়

কই মাছ প্রতিপালন

5 পাতার পর

কই মাছের ফিনগারলিংদেশা ছোট পুকুরে হেক্টরপ্রতি ৫০,০০০ সংখ্যায় মজুত রেখে পাঁচমাস পালন পর্বের শেষে হেক্টরপ্রতি ১৯২০ কেজি পরিণত ও বাজারজাত কই মাছ উৎপাদন করেছেন। যখন অল্প গভীর জলাশয় শুকিয়ে যায়, তখন এরা ভিজে পাঁক ও কাদা মাটির মধ্যে গর্ত করে বসবাস করে।

পোদ কই বা বট কই ঃ— এই দেশীয় মাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্যাডিস ব্যাডিস। মাছটি সাধারণত ৫-৬ সেমি দৈর্ঘ্যের হয়, তবে সাড়ে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হতে পারে। এই মাছটির কানকোয় কোন রকম ধারালো কাঁটা উপস্থিত থাকে না, কানকো দুইটি মসৃণ হয়। এরা বিল, ঝিল, পুকুর ও ডোবাতে অপরিষ্কার জলে বসবাস করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জলজ পরিবেশে এদের শরীরের রঙও ভিন্ন হয়। হালকা ঘোলাটে ধীরগতির ছোট নদীর জলেও এরা থাকে, বিশেষত জলস্তরের নীচে যেখানে পলিমাটি জমে থাকে এবং উপরিভাগ জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। যে সমস্ত স্থির জলাশয়ে অনেক পদ্মফুল ও বড় পদ্মপাতা বিছিয়ে থাকতে দেখা যায় এবং নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ থাকে, সেখানে পোদ কই এর দেখা পাওয়া যায়। এর পায়ুগত পাখনায় তিনটি শক্ত কাঁটা থাকে।

বিভিন্ন ধরণের অণুপ্রাণী খাদ্য বা জুপ্ল্যানকটন, ছোট কেঁচো, পোকা অর্থাৎ কীটপতঙ্গের লার্ভাদশা এরা খেতে পছন্দ করে। পরিণত স্ত্রী মাছ পুরুষদের চাইতে আকারে একটু ছোট হয়। মাছটির গায়ের রঙ ঘন বাদামী বা সবজে লাল। পুরুষদের গায়ের রঙ স্ত্রী মাছ এর তুলনায় একটু বেশী উজ্জ্বল হয়, তাই গৃহস্থ ঘরের কাঁচের বাহারি অ্যাকুরিয়ামের মাছ হিসেবে পুরুষ মাছের চাহিদা বেশী থাকে। মাছটির শরীরের উপরিভাগে, শরীরের মাঝামাঝি, পিঠে এবং পৃষ্ঠপাখনার গোড়ায়, কানকোয় এবং লেজ পাখনার সামনের দিকে ছোট ছোট স্পষ্ট কালো রঙের একাধিক বিন্দু বা স্পট উপস্থিত থাকে। পুরুষ মাছের পাখনাগুলি উজ্জ্বল নীল রঙের হয়। প্রজননের সময়ে পুরুষ মাছের শরীরের রঙ কালো হয়ে ওঠে। প্রজননক্ষম স্ত্রী মাছ প্রতিবার ৩০-১০০ সংখ্যক ডিম প্রসব করে। দেশীয় কই মাছের তুলনায় পোদ কইয়ের পৃষ্ঠপাখনার শক্ত কাঁটাগুলি কিছুটা নরম হয়।

উপসংহার ঃ— পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষায় যখন খাল, বিল জলে ভরে যায়, তখন আমাদের দেশীয় কই মাছ স্বাভাবিক প্রজনন করে এবং শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় এক মাস বয়সী ১.০-১.৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের বাচ্চা কই মাছ ফান্দি জাল বা কারেন্ট জাল ব্যবহার করে প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে ধরা হয়, গ্রামের হাটে সেইগুলি ৭০-৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয় এবং গ্রাম্য গৃহস্থঘরে তা রান্না করে খাওয়া হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে জলমগ্ন ধানজমির (১.৫-২.০ ফুট জলস্তর) চারধারের আল-এ ফান্দী জাল পেতে রেখেও মাঝারী আকারের দেশি কইমাছ ধরে ফেলা হয়। পৌষ-মাঘ মাসে যখন বড় জলাভূমি, বিল ও দিঘীর জল পাম্প বসিয়ে ছেঁচে নেওয়া হয়, তখন ১০-১১ ফুট গভীর বিলের জলস্তর কমে গিয়ে ৪.০-৪.৫ ফুট-এ এসে দাঁড়ায়, জলাশয়ের মধ্যিখানের গর্ত অঞ্চল থেকে বড় ৭০-৯০ গ্রাম ওজনের কইমাছ ধরে নিয়ে মাছের আড়তে সরবরাহ করা হয় - পাইকারি মৎস্যবিক্রেতারা তা কিনে নিয়ে ৪০০-৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করে।

লেখক ঃ সুব্রত ঘোষ, ফিসারী ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, কুশমন্ডী ব্লক, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর।

কুলিয়া বিলের (নদিয়া) সমীক্ষা ও তার প্রয়োজনীয়তা

কল্যাণী, গয়েশপুর, মাঝিপাড়া,পলাশী, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, শিমুরালি, হরিণঘাটা, চাকদহ, হালিসহর প্রভৃতি অঞ্চলে ২০০ এর বেশি জলাশয় রয়েছে যথা - কুলিয়া বিল, মথুরা বিল, কল্যাণী লেক, গয়েশপুর লেক, যমুনা খাল, বাগ খাল, বয়সা বিল, কালিয়াগঞ্জ বিল, সুনীতি ঝিল, মৌন্ডরি বিল, মাটিকাটা বিল সহ আরো ছোট বড়ো অনেক জলাশয় রয়েছে।

সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী বছরে ৬৫-৭৫ প্রজাতির প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার পরিযায়ী পাখি শীতকালে এই সমস্ত বিলে বা জলাশয়ে আসে। কুলিয়া বিলে সবচেয়ে বেশি পাখির সমাগম হয়। ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ জলের গুনগত মান পরীক্ষা করা হয়েছিল। ফলাফল ঃ- জলের পি. এইচ ৭.৪৫ লবনাক্ত ২৬৫ পি.পি.এম অক্সিজেনের মাত্রা ৯.৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে কঠিন পদার্থ ৩৪৫ ও ৬৪৬ পি.পি.এম। স্থানীয় পৌর এলাকার কারখানার ড্রেনের দূষিত এবং ময়লা জল লেকের জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট করছে। এর ফলে পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখির সংখ্যা ক্রমশঃ কমছে। সমীক্ষা অনুযায়ী অবৈধভাবে জলাশয় প্রতিনিয়ত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ১) পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫, ২) অন্তর্দেশীয় মৎস্য আইন ১৯৯৩ সহ আরো এরকম ৮টি আইন অনুযায়ী জলাশয় ভরাট করা একটি সামাজিক অপরাধ।

সমীক্ষার ফলাফল ঃ— ১) কুলিয়া বিল সহ অন্যান্য বিলের বিভিন্ন ধরণের পরিযায়ী ও স্থানীয় পাখিদের রক্ষা করা প্রয়োজন। ২) পশ্চিমবঙ্গ বায়ো ডাইভারসিটি বোর্ডের উদ্যোগে এবং বন ও পরিবেশ দপ্তরের সহযোগিতায় কুলিয়া বিলে একটি পক্ষীরালয় (অভয়ারণ্য) তৈরি করা সম্ভব। ৩) এলাকার প্রতিটি জলাশয়, খাল ও বিল ভালোভাবে রক্ষা করতে পারলে মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, পরিবেশ পর্যটনের মধ্যে দিয়ে কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

— জয়দেব দে ও অনুপ হালদার।

যোগাযোগ ঃ প্রতাপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর-৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৩৩২২৮৩৩৫৬, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম-৯৪৩৪৬৮৬৭৪৯ শান্তিপুর সায়েন্স কাব, মোঃ-৯৬০৯৮৪৪৬৭৬

কেন পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন দানা বাঁধছে না

প্রায় ২৫ বছর এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার ফলে আমার ও আমাদের বন্ধুদের যে অনুভূতি তা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।

চাকদহের একটি নাটকের কাব 'হ-য-ব-র-ল', -এই গ্রুপ থিয়েটারে নাটক দিয়েই শুরু করেছিলাম স্কুল জীবনে। তখন যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন করতেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। শম্ভু মিত্র, শাঁওলি মিত্র, বিভাস চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (রুদ্রদা), অশোক মুখোপাধ্যায় (অশোকদা), আমাদের কাবের নাট্য নির্দেশক প্রয়াত অমল বিশ্বাস এবং আমার মা প্রয়াত ভূমিকা ভট্টাচার্য। এই সময় এই গ্রুপ থিয়েটার করা মানুষগুলোর একবেলা খাওয়া জুটতো কি জুটতো না তাতে কিছু এসে যায় না। কোন ডায়লগ দর্শকের কানে কেন পৌঁছালো না অথবা এবার থেকে ভাল করে স্ট্যালিনভস্কি অথবা ব্রেখট পড়তে হবে। গায়ক অজিত পান্ডে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমাদের বাড়িতে থাকতেন তখন বাঁশবেড়িয়া-হাওড়া লাইনে উনি 'দেশব্রতী' কাগজ বিক্রি করতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাসও আমাদের বাড়িতে আসতেন। একদিন অজিত মামার (অজিত পান্ডে) সাথে কি গন্ডগোল হারমোনিয়াম নিয়ে। অজিত মামা কিউবায় গান গাইতে যাবেন। প্লেনে হারমোনিয়াম নিয়ে গেলে বেশি পয়সা লাগবে তারপর এত ভারি, কিন্তু হেমাঙ্গদাদু জোর করে বললেন "তোকে হারমোনিয়াম লইয়া যাইতে হইব। আমাগো দেশের হেরিটেজ এইটা লইয়া গেলে তোর সম্মান বৃদ্ধি পাইব।" প্রথমে রাজি না থাকলেও পরে রাজি হলেন অজিত মামা এবং হারমোনিয়াম নিয়ে রওনা হলেন কিউবা। কিউবা থেকে ফিরে এসে বললেন ওদেশে অরগ্যান চালু তাই হারমোনিয়াম দেখে পাগল হয়ে গেছে ঐ দেশের মানুষ। আসলে পেটে খাবার থাকুক না থাকুক সংস্কৃতি ও শিল্প চর্চায় ওদের ডেডিকেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু সে সময় আমার মনে হত শুধু নাটক আর গান গেয়ে ব্যবস্থা পাল্টানোর যে স্বপ্ন দেখে এই গোষ্ঠী তা মনে হয় ঠিক নয়। কিন্তু তাঁদের আবেগ ও প্রত্যয় আমাকে উজ্জীবিত করত।

কিন্তু সেই সময় যাঁরা পরিবর্তনের আন্দোলন করতেন তারা রাষ্ট্রের ভয়ংকর কুম্বিং অপারেশনের ফলে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। কলকাতা কলেজে পড়ার সুবাদে সুন্দরবনে গ্রাম উন্নয়নের কাজে প্রায় ১০ দিন সাতজেলিয়া থাকতে হয়। সেই সময়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কিছু মানুষের সাথে আলাপ হয় তাঁরাই আমার চিন্তার পরিবর্তনের মূল কারিগর। একটা কথা আজও মনে আছে "তুমি যদি প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক হও ও ধারাবাহিক ভাবে ছোটো ছোটো করে কাজ করে চল - সেই কাজটাই হবে ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজ।" এর সাথে বিজ্ঞান কাবের কী যোগ? গোবরডাঙ্গাতে তো একটা বিজ্ঞান কাব আছে, ওরা একটা রেডিও ষ্টেশন বানিয়েছে যার মধ্য দিয়ে কঠিন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার করে। আমি মাঝে মাঝে শুনি কিন্তু সব বুঝতে পারি না। তখন সেই অগ্রনী বিজ্ঞানকর্মীগণ যা বলেছিলেন তা তুলে ধরলাম।

একদল পন্ডিত মনে করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মানে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পদ্ধতি নিয়ে মানুষকে অবহিত করা। এই পদ্ধতি অনুসারে কোয়ার্ক কিম্বা নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা লেসার বা প্রীয়ন অথবা ভিরিয়ড নিয়ে আলোচনা হল বিজ্ঞান আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে মানী পন্ডিতবর্গকে বিজ্ঞানের আঙিনায় পাওয়া যাবে। বেশ একটা এলিট বিজ্ঞানচর্চাও চলবে। বিজ্ঞান আন্দোলন বলতে একদল বোঝেন সরকার যা প্রচার করছে তা' পুনঃপ্রচার করা। যেমন সৌরশক্তি ব্যবহার, শৌচাগার নির্মান, এড্স বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা, রাস্তার কাটা ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকা, সরকারি প্রচারকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এইগুলো হল বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ।

বিজ্ঞান চেতনা বা বিজ্ঞান মনস্কতার বিষয়ে প্রশ্ন এরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কুসংস্কার ও জ্যোতিষ বিরোধিতা ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ সরকারকে তা আঘাত না করে। যাঁরা এই কাজ করেন তাঁদেরকে ঐ বিজ্ঞানকর্মীগণ হটকারি বলে মনে করেন।

আর একদল বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী আছেন যাঁরা সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাসী। গুণে নয় পরিমানে বিশ্বাসী এঁরা। এটা একটা সামাজিক ব্যধি। তাই বিরোধিতা সংখ্যাগত নয়, বিরোধিতা গুণগত প্রশ্নে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার প্রশ্নে মানুষকে সামিল করতে গিয়ে আসল লক্ষ্যটা হারিয়ে গিয়ে সংখ্যাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায় তবে বিরাট ভুল হবে।

এইসব সুন্দর ও অসম্ভব ভাল কথা বলা মানুষদের যখন দেখি কেউ নর্থ দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যান, কেউবা সরকারি অনুগ্রহ নেবার জন্য নিজের বিজ্ঞান কাবকে শাসক দলের কাছে সমর্পন করে তখন একটু কষ্ট পাই।

আসল প্রশ্ন হল পরিশীলিত জীবনযাপন। বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় সঙ্কট হল মর্যাদাবোধ যা শাসককুল আপামর মানুষের থেকে লুঠ করতে সক্ষম হয়েছে। আর দর্শণ আর মূল্যবোধটাকে গুলিয়ে দিয়েছে কিছু বুদ্ধি বিক্রেতা। তাই রাজনৈতিক সংগঠন থেকে কাব সংগঠন চালাতে গেলে ডোলে দিতে হবে। অল্প একটু মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধ থাকলে তুমি বোকা লোক। প্রশ্নটা তাই এই বোকা লোকদের দলে আমরা থাকব কি থাকব না। কিম্বা এইসব করে জনপ্রিয় হয়ে সংসদীয় রাজনীতিতে যোগদান করব কি? খুব ভাল করে ভাবনার সময় এসেছে। সরল মনে গ্রামের বিজ্ঞান সংগঠন যে হাতটি ধরছে তার কিছুদিন পরে তারা বুঝতে পেরেছে ঐ হাতটি কৃত্রিম। সে যুক্তিবাবাই হোক অথবা অতি প্রগতিশীল জালিয়াতটি।

প্রথম থেকেই আমরা শিখেছিলাম বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে উত্তরিত কর্মীগণ ব্যবস্থা পরিবর্তনের আন্দোলনে যোগদান করবেন কিন্তু পিছিয়ে থাকা কিছু বিজ্ঞানকর্মী ছাড়া খুব একটা কাউকে দেখতে পাইনি।

আমার মনে হয়েছে আমরা যারা বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিক তাদের মধ্যে এই কূটকাচালি থাকবে কেন? আমরা তো সবাই একই উদ্দেশ্যে কাজ করছি তবে কেন এই নিন্দামন্দ করা। আমরা সবাই যদি এই বিদ্বেষহীন সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হই তবে এই স্বপ্নকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। চলতে থাকুক আলোচনা, তর্ক, বিতর্ক কিন্তু শাসকের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বিপদে পড়া বন্ধুর পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নিন এই সভায়। তবেই শক্তিশালী হবে গণবিজ্ঞান আন্দোলন।

— লেখক ঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

সাপ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা

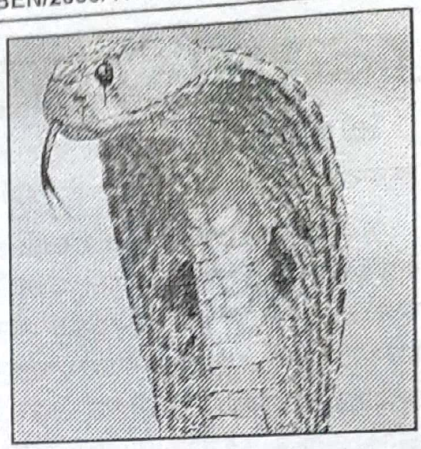

সাপ নিয়ে অনেক গল্প আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে আমরা ধরে নিই যে সেগুলি বুঝি সবই সত্যি। একটু ভালো করে ভাবলে বোঝা যাবে যে সেগুলি সবই আজগুবি গল্প। এরকমই কয়েকটা গালগল্প নীচে বলছি।

সাপের মাথায় মণি ঃ— সাপের মাথায় কি মণি থাকে? অনেকে বলবেন, হ্যাঁ থাকে। কেউ কি কখনও দেখেছেন? এবারে সকলেই বলবেন না। যদি প্রশ্ন করা হয় কেন দেখেননি? এর উত্তরে অনেকেই বলবেন সাপ তো সব সময় মণি মাথায় লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় না? তাহলে কী করে? খুলে তা লুকিয়ে রাখে। প্রয়োজনে পরে। অনেকটা সোনার গয়না পরার মত। সাপের কি হাত-পা আছে যে ইচ্ছা মত মণি মাথায় লাগাবে আবার খুলে রাখবে? আসলে যেটা হয় সেটা হল, কোনো কোনো সাপের গায়ে ও মাথায় উজ্জ্বল রঙের আঁশ আছে। এছাড়াও এদের গায়ে সাবান জলের বুদবুদের মতো এক ধরণের বুদবুদ দেখতে পাওয়া যায়। রাতে বনে জঙ্গলে সাপ যখন ঘুরে বেড়ায় তখন চাঁদের আলো এই আঁশ বা বুদবুদে পড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। তখন এগুলি চকচক করে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন কোনো রত্ন জ্বলজ্বল করছে। এটা দেখে কেউ কেউ সাপের মাথায় মণি আছে বলে ভুল করতে পারেন।

বাঁশির সুরে সাপের নাচন ঃ— সাপুড়েরা যখন সাপ খেলা দেখায় তখন দেখা যায় যে তারা যখন বাঁশি বাজায় তখন সাপ মাথা দোলায়। তা দেখে অনেকের ধারণা, বাঁশির সুর শুনে সাপ মাথা দোলায়। সত্যিই কি তাই? সাপের আমাদের মত কোনো কান নেই। যেটা আছে সেটা হল অন্তঃকর্ণ। সেটাতে আবার পর্দা নেই। বাইরে কোন কান নেই, কানের পর্দা নেই, তাহলে সাপ শোনে কীভাবে? যদি শুনতে না পায় তাহলে সুরের তালে তালে দোলে কেন? এরা যে সুরের তালে তালে দোলে সেটা জানা গেল কীভাবে? উত্তর নিশ্চয় জানা নেই? আসলে যেটা ঘটে সেটা হল, সাপের দুলুনি হয় সাপুড়ের বাঁশির দুলুনির জন্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সাপুড়ে যখন বাঁশি বাজায় তখন সে বাঁশিটিকে দোলাতে থাকে। সাপ চোখে ভাল দেখে না। ঝাপসা দেখে। সাপুড়ে পেট মোটা বাঁশিটা যখন দুলিয়ে দুলিয়ে বাজাতে থাকে তখন সাপটি বুঝতে পারে যে তার সামনে ঝাপসা দেখতে কোনো একটা কিছু দুলছে। নিরীহ সাপটি ভয় পেয়ে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে ফণা তুলে সেই আবছা দেখা বস্তুটিকে ছোবল মারতে উদ্যত হয়। বাঁশি ছাড়াও অন্য কিছু সাপটির সামনে দোলালে একই ঘটনা ঘটবে। তাই বলা যায়, সাপের দোলার কারণ বাঁশির সুর নয়, বাঁশির নড়াচড়া।

সাপের দুধ-কলা খাওয়া ঃ— 'সাপ দুধ-কলা খায়' - এমন বিশ্বাস আমাদের মধ্যে অনেকদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু হলপ করে কেউ কি বলতে পারবেন যে তিনি নিজের চোখে এমন ঘটনা দেখেছেন? এমন ঘটনা ঘটা সম্ভবই নয়। সাপ আমিষভোজী। এদের স্বাভাবিক খাবার ইঁদুর, ব্যাঙ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। দুধ-কলা এদের খাদ্য তালিকায় কোনো দিনই ছিল না। সাপের জিভ সরু এবং চেরা। তাই কোনো কিছু চুষে খাওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও চুষে খেতে যে জোর লাগে সেই জোর এদের ফুসফুসে নেই। বহুদিন ধরে চলে আসা 'সাপের দুধ-কলা খাওয়া'র গল্প, একটি ভ্রান্ত ধারণা।

বাস্তু সাপ ঃ— গ্রামে-গঞ্জে বাড়ির চারপাশে ঝোপঝাড়, পুকুর, গাছপালা থাকাটা স্বাভাবিক। অধিকাংশ বাড়িঘরও মাটির তৈরি। বাড়ির উঠোনে থাকে গোলাভরা ধান। ধান খাওয়ার লোভে ইঁদুর আসে। আসে পোকামাকড়। পোকামাকড়ের লোভে ব্যাঙ ঘুরে বেড়ায় বাড়ির চারপাশে। ইঁদুর আর ব্যাঙের লোভে লোভে সাপেরা এসে জড়ো হয় বাড়ির কাছাকাছি ঝোপঝাড়ে। কোনো সাপ বাড়ির কাছাকাছি কোনো ইংদুরের গর্তে হয়তো বাসা বেঁধে ফেলে। এদেরই দিনের পর দিন বাড়ির আশেপাশে দেখা যায়। এরাই হল বাস্তু সাপ। এদের সম্পর্কে নানারকম বিশ্বাস ও সংস্কার প্রচলিত আছে। যেমন — ১) বাস্তু সাপ মারা মহাপাপ। ২) এদের মারলে পরিবারে অমঙ্গল হয়। ৩) হত্যাকারীর বংশ নাকি নির্বংশ হয়।

অনেকে মনে করেন এরা তাদের পোষা সাপ। পরিবারের সদস্য। এমন ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রশ্ন করলে শোনা যায়, 'চলে আসছে তাই মানা'। মনে রাখতে হবে কোনো সাপই পোষ মানে না। বাস্তু সাপ যদি বিষধর হয় তাহলে তাকে উত্তেজিত করলে ছেড়ে কথা বলবে না। ছোবল মারবেই। নির্বিষ সাপও যে কামড়াবে না এমন কোনো কথা নেই। তবে এদের কামড়ে কারও মৃত্যু হবে না। সাপের এমন কোনো বোধবুদ্ধি নেই যে তারা বাস্তুর মালিকের পরিবারের প্রতি মায়ামমতা দেখাবে।

মন্ত্রের জোরে সাপ বশে আনা ঃ— এটা কি সম্ভব? সাপ তো শুনতেই পায় না। তাহলে সে মন্ত্র শুনবে কীভাবে? এছাড়াও সাপের কোনো বোধবুদ্ধি নেই। তাহলে মন্ত্র বোঝার মত মস্তিষ্ক এদের আছে কী? মন্ত্র বলে যা উচ্চারিত হয় তার অধিকাংশই প্রকৃতি বন্দনা। সাপ বশ করা যায় এমন কোনো অলৌকিক ক্ষমতা এতে আছে বলে জানা নেই। সাপ ধরা হাতের কৌশল। এর জন্য দরকার সাহস ও চোখের নজর। কৌশল জানা থাকলে এবং অভ্যাস থাকলে যে কেউ সাপ ধরতে পারবে।

— লেখক ঃ কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭এ সেন্টাল রোড, ফ্ল্যাট-৩এ, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, মোঃ- ৯৪৩৩১৪৫১১২

যোগাযোগ—বিজ্ঞান অন্বেষক ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মণ্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ স্নিগ্ধা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩ E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০) bijnandarbar1980@gmail.com